মাযহাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কবরে যা প্রশ্ন করা হবে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"কুল্লু নাফছিন যাইকাতুল মাউত।"

অর্থাৎ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী।" **{সূরা আনকাবুত, ২৯:৫৭}**

অনুরূপ **সূরা আল-ই-ইমরান {৩:১৮৫}** এবং **সূরা আল আম্বিয়ায় {২১:৩৫}** উল্লেখ করা হয়েছে **"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"**

স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দুনিয়ার আয়ুষ্কাল যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে সেদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে কবরে রাখার পরপরই মুনকার-নকীর প্রশ্ন করবে, "বল, তোমার রব কে; তোমার দ্বীন কি" এবং রাসূলের (সঃ) সূরত মোবারক দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, "ইনি কে?" তখন অথবা পরবর্তীতে হাশরেও কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হবে না, "তোমার মাযহাব কি; তুমি কেন অমুক ইমামের তরীকা মোতাবেক চলনি" ইত্যাদি। বরং জিজ্ঞাসা করা হবে, "তুমি কেন রাসূলের (সঃ) নির্দেশিত তরীকা (বা মাযহাব) মোতাবেক চল নাই?"

রাসূল (স.)-এর সালাত এবং সাধারণ মুসল্লীদের সালাত আদায়ের মধ্যে ভিন্নতার কারণ

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের বাস্তব সালাত এবং রাসূলের (স.) সালাতের তরীকার মধ্যে সচরাচর অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। অথচ সহীহ হাদীস অনুযায়ী রাসূলের (স.) সালাতের একটি মাত্রই নিয়ম ছিল। তবে কোন কোন সময় কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা দিত। যেমন, তিনি কখনো সালাতকে লম্বা করতেন আবার কখনো সংক্ষিপ্ত করতেন, এমনি ভাবে সিনার উপর হাত রাখার পর কখনো ডান হাতকে বাম বাহুর উপর রাখতেন, আবার কখনো কব্জির উপর রেখে ধরতেন, আবার কখনো হাতের উপর হাত রাখতেন। এমনি ভাবে **রাফ'উল ইয়াদাইন** করতে কখনো তিনি কাঁধ পর্যন্ত আবার কখনো কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। মোট কথা এই পার্থক্যগুলি ছিল শুধু বাহ্যিক কার্যভঙ্গি এবং লম্বা ও সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে, কিন্তু কাজটি করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না। **এই পার্থক্যের মূল কারণগুলি হল রাসূল (স.)-এর সালাত আদায় পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, মাযহাবগত ভ্রান্ত ধারণা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।**

ইসলামে বিভিন্ন দল/ফিরকা সৃষ্টি

রাসূল (স.) বলেছেন, "বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স.), সে দল কারা?" উত্তরে রাসূল

(স.) বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে তরীকার উপর চলছে, যে দল সেই তরীকা মত চলবে সেই দলই বেহেশতী।" (তিরমিজী)

রাসূল (স.)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন এই কোরআন ও সুন্নাহর জীবন ব্যবস্থার উপর কায়েম ছিলেন, এক চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি। পরবর্তীকালে অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীগণও কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কিছুমাত্র রদবদল হতে দেননি। বরং রাসূল (স.)-এর কোন হাদীস তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হলে বিনা শর্তে তা মেনে নিতেন। সাজাবা কেরাম ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী যুগে যেমন নানা দেশের, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের লোক ইসলামের পতাকা তলে আসতে লাগল তেমনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধর্মমত ও দার্শনিক মতবাদও আসা শুরু হল। ফলে, মুসলিমগণ নীতিগতভাবে এক আল্লাহকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ও তাঁর রাসূল (স.)-কে একমাত্র নেতা বলে স্বীকার করলেও কার্যতঃ তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ইসলামের প্রকৃত নীতি হতে সরে যেতে লাগল এবং কোনো কোনো সম্প্রদায় একেবারে ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে গেল। ফলে, মুসলিম জাতীয় জীবনে ভাঙ্গন শুরু হল। তারা রাসূল (স.)-এর নেতৃত্ব ত্যাগ করে বিভিন্ন নেতার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ইসলামে শুরু হল ফিরকাবন্দী। অখন্ড ইসলাম হয়ে গেল খন্ড বিখন্ড।

বিভিন্ন দল/ফিরকার সংখ্যা

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর "৭৩ ফিরকার বিবরণ" গ্রন্থে সমগ্র মুসলিমগণকে প্রথমতঃ ১০ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- (১) আহলে সুন্নাত, (২) খারিজী, (৩) শিয়াহ, (৪) মুতাজিলা, (৫) মুরজিয়া, (৬) মুশাব্বিয়া, (৭) জাহমিয়া, (৮) জরারিয়াহ, (৯) নাজ্জারিয়া এবং (১০) কালাবিয়াহ।

উপরোক্ত দলগুলির মধ্যে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য দল হল আহলে সুন্নাত কারণ একমাত্র এরাই কোরআন ও সুন্নাহ অবলম্বন ও অনুসরণ করে থাকেন এবং প্রমাণস্থলে উভয়কেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

অন্য ৯টি দল হতে বাহাত্তরটি উপদল বা ফিরকার সৃষ্টি হয়েছে। এ দলগুলো সাহাবাদের বহু জামানার পর সৃষ্টি হলেও কোন কোন সাহাবাদের জীবদ্দশায় দু একটি বিদ'আতের সূত্রপাত হয়েছিল। সাহাবাগণও সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর প্রতিবাদ করেছেন। একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শুনলেন যে কিছু লোক মসজিদে সমবেত হয়ে হালকাবদ্ধভাবে বসে (অর্থাৎ কয়েকজন গোল হয়ে বসে) **লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, সুবহানাল্লাহ** ও দরূদ প্রভৃতি পাঠ করছে। এই খবর পাওয়া মাত্র তিনি মসজিদে এসে সমবেত লোকদের বললেন, "হে লোক সকল, রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর এখনও খুব বেশী দিন অতীত হয়নি, তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এখনও বিদ্যমান রয়েছে, আর তোমরা এখনই তাঁর শরীয়তকে পরিবর্তন করতে আরম্ভ করে দিয়েছ? দেখ, আমি রাসূলের (স.) যামানায় এভাবে কলেমা

ও দরূদ পাঠ করতে দেখিনি।" এভাবে সতর্কবাণী করতে করতে তিনি তাদের মসজিদ হতে তাড়িয়ে দিলেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী তাঁর উপরোল্লিখিত গ্রন্থে উক্ত নয়টি দল যে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে সেগুলির নাম উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্তভাবেঃ

দল	দলের নাম	দল/উপদলের সংখ্যা
১ম	খারেজী	১৫
২য়	শিয়া ৩ দলে বিভক্ত	
	(i)	১২
	(ii)	৬
	(iii)	১৪
৩য়	মুতাজিলা	৬
৪র্থ	মুর্জীয়া	১২
৫ম	মুশাব্বিয়া	৩
৬ষ্ঠ	জহমিয়া বা জব্‌রিয়াহ	১
৭ম	জরারিয়াহ	১
৮ম	নজ্জারিয়াহ বা ছেফাতিয়াহ	১
৯ম	কালাবিয়াহ	১
	মোট -	**৭২ উপদল বা ফিরকা**

উপরোক্ত দল/উপদলগুলি বহু যামানা পরে সৃষ্টি হলেও কোন কোন সাহাবার জীবদ্দশায়ই দু একটি বিদ'আতের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু সাহাবাগণ সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই এর ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন। **(তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া**, ১ম খন্ড; মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোহাম্মদী সালাফী)

ফিরকা উদ্ভবের কারণ ও পরিণতি

কোরআন ও হাদীসের ব্যবহারিক পতনের পটভূমিকায় পৃথিবীতে ফিরকাবন্দী বা দলীয় মাযহাব সমূহের আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। বনী উমাইয়া শাসনের অবসানকাল অর্থাৎ নূন্যাধিক ১৫০ হিজরী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি বলতেন না বরং স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন। আব্বাসীয়দের শাসনকালে সর্বপ্রথম প্রত্যেকেই নিজের জন্য পৃথক পৃথক দলীয় নাম নির্ধারিত করে নিতেন এবং নিজ গুরুদের নির্দেশ খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতেন। সুতরাং মতভেদ দৃঢ়তর হল, মাযহাবের সূত্রপাত হল।

মাযহাবের মহাব্যাধি মুসলমানগণের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করায় সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল শিয়া সম্প্রদায় ও দলপন্থী সুন্নীগণ। উত্তর কালে এই শিয়া সুন্নীর লড়াই আর মাযহাব চতুষ্টয়ের অন্ধ অনুসারীগণের উদ্দাম, অবিশ্রান্ত ও নির্মম গৃহযুদ্ধের ফলেই মুসলিমগণের উজ্জ্বল জাতীয় গৌরব অস্তমিত হয়ে যায়। ৩১৭ হিজরীতে একটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত মকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা নিয়ে বাগদাদে হাম্বলী ও অপর তিন মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়, এই সংগ্রামে সৈন্য বাহিনী ও জনসাধারণও যোগ দেয় এবং শত সহস্র লোক হতাহত হয়। ৩২৩ হিজরীতে হাম্বলী ও শাফেয়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে ৭ বৎসর পর্যন্ত চলে। ৩৯৮ হিজরীতে বাগদাদ শহরে সুন্নী ও শিয়াগণের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে অসংখ্য লোক নিহত হয়। ইমাম কুশয়রী ৪৪৮ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং আকীদা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি হাম্বলীদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন, কারণ তিনি নিজে গোড়া আশাইরা মতবাদের ছিলেন। এই বিবাদ শেষে সংগ্রামে রূপ নেয় এবং উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এভাবে ৪৮৩ হিজরীতে বাগদাদ নগরে শিয়া ও সুন্নীগণের মধ্যে, ৫৫৪ হিজরীতে নেশাপুর শহরে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে, পুনরায় ৫৬০ হিজরীতে হানাফী শাফেয়ীদের মধ্যে, ৫৮৭ হিজরীতে মিসরে হাম্বলী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শিয়া ও সুন্নীগণের মধ্যে সংঘর্ষে ভয়াবহ লুটতরাজ, হত্যাকান্ড চলে, বহু বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়। এ ধরণের মাযহাবগত দলাদলি অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সুযোগ নিয়ে চীনের মঙ্গোলিয়া হতে আগত চেঙ্গীস খাঁ ও হালাকু খাঁ বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। ৬৫৬ হিজরীর ১২ই মুহাররম হালাকুর সৈন্যদল বাগদাদে প্রবেশ করে এবং ১৪ই সফর বুধবার খলীফাতুল মুসলেমীন শহীদ হন। খলীফার দুই পুত্র আমীর আবু বকর আহমদ ও আবুল ফাযায়েল আবদুর রহমানকে তাতারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং খলীফার কন্যা ও পূর-মহিলাগণকে দাসীতে পরিণত করে।

ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর রচিত **'ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব'** পুস্তকে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ও হালাকু খানের বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ এর রাজত্বকালে শিয়া, সুন্নী এবং হানাফী ও হাম্বলী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। খলিফা শিয়া সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য অভিযান পাঠালে শিয়া মতাবলম্বী মন্ত্রী মুযাইদ উদ্দিন মুহম্মদ আলকামী হালাকু খানকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে খলিফার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করেন। হালাকু খান ১২৫৮ খৃঃ বাগদাদে অভিযান করেন। দীর্ঘ চব্বিশ দিন অবরোধের পর খলিফা তার পরিবার-পরিজনসহ হালাকু খানের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ ভিক্ষা চান। কিন্তু হালাকু খান বাগদাদ দখলের দশ দিনের মধ্যে খলিফা ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করে। হালাকু খানের খৃষ্টান মন্ত্রী ডকুজ (Doquz) এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ব্যতীত প্রায় ২০ লক্ষ লোক মাত্র ছয় সপ্তাহে মোঙ্গল বাহিনীর বর্বরতা ও হত্যাকান্ডের শিকার হয়। কথিত আছে যে, তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথগুলিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ইউফ্রেটিস

নদীর পানি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। ঐতিহাসিক গিলম্যান বলেন, "এভাবে শতসহস্র নিহতের গগণভেদী আর্তনাদ এবং বর্বর বিজয়োন্মত্ত মোঙ্গলদের প্রকট উন্মাদনায় যে বাগদাদ পাঁচশত বৎসর ধরে শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের গৌরবোজ্জল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ৬৩২ খৃঃ রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর মদীনায় যে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা দীর্ঘ ছয় শতাব্দীরও বেশী সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলার পর ১২৫৮ খৃঃ মোঙ্গলদের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে শুধু একটি সাম্রাজ্যেরই পতন হল না, একটি সভ্যতারও অবসান হল।

মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সুন্নী ইসলামের বিপর্যয় ঘটে। শিয়া ও সুন্নীদের বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। মুসতাসিমের খিলাফতে শিয়া প্রধান উজীর আলকামী হালাকু খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস পান এবং এর মূলে ছিল সুন্নী ইসলামের প্রতি তার বিদ্বেষ। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নাসির উদ্দিন তুসী হালাকু খানের পরামর্শদাতা ছিলেন। এর ফলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনে সুন্নী ইসলাম যে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা হতে পুনরুদ্ধার করা আর সম্ভবপর হয়নি। বলা বাহুল্য, আব্বাসীয় খিলাফতের পতনে সুন্নী মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতীক হারিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঐতাহাসিক হিট্টি বলেন, "ইতিহাসে প্রথমবারের মত মুসলিম বিশ্ব খলিফা বিহীন হয়ে পড়ে যার নাম শুক্রবারের জুম'আর সালাতে খুতবায় উচ্চারিত হয়নি।"

প্রফেসর ব্রাউন তার বিখ্যাত Literary History of Persia বইতে বাগদাদের পতন কাহিনীর এভাবে বর্ণনা দেন- "বাগদাদের লুণ্ঠন কাজ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয় এবং সপ্তাহকাল চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আট লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বাগদাদ মহানগরী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আব্বাসী খলীফাগণের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তার সমুদয় ধনভান্ডার এবং সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ যা দীর্ঘকাল হতে সঞ্চিত হয়ে আসছিল সমস্তই লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তাতারীদের দ্বারা মুসলিম সংস্কৃতির যে মহা সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা কখনও পূরণ হতে পারেনি। এই ক্ষতির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব ও কল্পনাতীত। কেবল যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল তা নয়, অগণিত বিদ্বজ্জন মন্ডলীর বিনাশ সাধন দ্বারা অথবা রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ নিয়ে তাদের পলায়ন করার দরুণ মৌলিক গবেষণার পদ্ধতি এবং সঠিক রেওয়ায়েত সমূহের সনদগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিরাট ও মহান সভ্যতাকে এত দ্রুত আগুনে ভস্মীভূত ও রক্তসমুদ্রে নিমজ্জিত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। তাতারী অভিযানের ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলি যথা সমরকন্দ, বুখারা, খোরাসান, আজারবাইজান, মসুল এবং ইউরোপের কতকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।"

জাতীয় জীবনের উল্লিখিত ভয়াবহ বিপর্যয় ও সংকটের মূল কারণ ছিল মুসলমানদের গৃহ বিবাদ এবং গৃহ বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল মাযহাবী কোন্দল এবং তাকলীদ পরস্তদের গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ।

দুঃখের বিষয় এত বড় আঘাতের পরও মুসলমানগণ সমবেতভাবে চৈতন্য লাভ করতে পারে নাই এবং নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ আজ তাতারী অভিযানের স্থানে নাস্তিকতা ও জড়বাদের যে সয়লাব সমগ্র ইসলাম জগতকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য তারা কোরআন ও সুন্নাহ-র দিকে ফিরে আসতে প্রস্তুত হচ্ছে না।

ঐতিহাসিক ইয়াফেয়ী (মৃ ৭৬৮ হিঃ) ইসলাম জগতের তৎকালীন দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে লিখেছিলেন, হায় দুরদৃষ্ট। ইসলাম কি ভয়াবহ বিপদে আক্রান্ত হয়েছে এবং হানাফী-শাফেয়ী ও অনুরূপ কলহ সমূহের কি হৃদয় বিদারক পরিণতি ঘটেছে। প্রত্যেকটি দল যে মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে তার গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে স্বীয় দলভুক্ত দুশ্চরিত্রদেরকে অকপট সমর্থন জ্ঞাপন করছে, আর অন্য মাযহাবের যারা প্রকৃত সাধুসজ্জন, তাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছে অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুস্কার্যকে তারা সত্যপরায়ণতা ও সত্যের সহায়তা বলে ধারণা করছে, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন,

“ওয়া’তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়াও ওয়ালা তাফাররাকু।”

‘তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’ **{সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ১০৩}**

আল্লাহ আরও বলেছেন,

“ইন্নাল্লাযীনা ফাররাকু দীনাহুম ওয়া কানু শিয়াআল্লাসতা মিনহুম ফি শাইয়িন।”

‘যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই’ **{সূরা আল আনয়াম, আয়াত ১৫৯}**

মুসলমানদের মধ্যে মাযহাব নিয়ে আত্মকলহ মারাত্মক আকার ধারণ করলে বিবরুহ বাদশাহর আমলে মিশরে চারটি মাযহাব সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং চার মাযহাবের জন্য চারজন সরকারী কাজীও নিযুক্ত করা হয়। ৬৬৫ হিজরীতে সরকারীভাবে চার মাযহাব স্বীকৃতি লাভ করায় ইসলামী দুনিয়া হতে অন্য মাযহাবগুলি লোপ পেতে থাকে। চরম পরিণতি স্বরূপ ৮০১ হিজরীতে সুলতান ফরহ বিন বরকুক সরকেশী পবিত্র কাবা ঘরের চার পাশে চার মাযহাবের জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন মুসল্লা নির্দিষ্ট করে দেন। তখন থেকে এক আল্লাহর দ্বীন এবং মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। অর্থাৎ সত্য ধর্মকে চারটি মাযহাবে বিভক্ত করে নবীর দ্বীনে বিপর্যয় ঘটান হল। এই ঘটনার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর সৌদী আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদের রাজত্বকালে ১৩৪৩ হিজরীতে কাবার হেরেম হতে এ জঘন্য বিদ’আত উৎপাটিত হলেও পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম প্রধান দেশে এই মাযহাবগত বিভক্তি এখনও প্রকটভাবে বিদ্যমান।

পিডিএফ বিন্যাসঃ ট্রু ক্যাফে সাইবারক্যাফে

ভারত উপমহাদেশে অপসংস্কৃতিই মাযহাব উদ্ভবের কারণ

ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণের মধ্যেও এই মাযহাবগত বিভক্তি প্রকটভাবে বিদ্যমান। বিভিন্ন যুগে মধ্য এশিয়া হতে সামরিক শক্তি দ্বারা এই উপমহাদেশ আক্রান্ত হয়েছে, তাদের দ্বারা বহু বৎসর এই দেশ শাসিত হয়েছে, পরবর্তী দুই শত বৎসর ধরে ইংরেজরা শাসন করেছে এবং বহু পীর, ফকির, আউলিয়া দরবেশ এদেশে ইসলামী দাওয়াত নিয়ে এসেছে। ফলে এদেশের আদি ধর্মানুরাগীগণ যারাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তারা তাদের পুরাতন ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, দার্শনিক মতবাদ ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামী আকীদাহ-র সংমিশ্রণে কোরআন ও হাদীসের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে বিভিন্ন নেতা ও পীরের অধীনে পৃথক মাযহাব-এ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজরা প্রায় ২০০ বৎসর এই উপমহাদেশ শাসনকালে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন সহ বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের পুস্তক প্রণীত হয়। সেকেন্দার আলী ইব্রাহীমি কর্তৃক লিখিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal গ্রন্থ হতে জানা যায় যে ভারতের মুসলিম সংখ্যা যখন এক তৃতীয়াংশে পৌঁছায় তখন মুসলিমরা মাদ্রাসা এডুকেশন নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী জানালে তৎকালীন ভারতবর্ষের শাসনকর্তা লর্ড হেষ্টীংস ১৭৮০ সনে সানন্দে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মইজুদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তিকে তিনি নিজ পকেট হতে ৩০০ টাকা বেতনে ঐ মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। (মোঃ নূরুল ইসলাম কর্তৃক প্রণীত পুস্তক 'আমরা কোন পথে!') ঐ সময় একজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের বেতন ছিল ১৫০ টাকা। লর্ড হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলিম দুই জাতিকে পৃথক করা। তাই তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা নেন এবং তাতে তিনি কৃতকার্যও হন। হিন্দু মুসলিম বিবাদ বাধিয়ে দেন এবং মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম হতে অপসারণের চেষ্টা চালান। মুসলমানরা অজ্ঞতার কারণে এই মুইজুদ্দিন কে, কোথাকার লোক, কোন জাতীয় তারও কোন খোঁজখবর নেন নাই এবং কি উদ্দেশ্যে লর্ড সাহেব নিজ পকেটের টাকা খরচ করে মুসলমানদের বন্ধু সাজেন তাও চিন্তা করে দেখেন নাই। ১৭৮১ সাল হতে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত ৩৮ বছর মাদ্রাসা পরিচালক দ্বারা এবং ১৮১৯ সাল হতে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালক পরিষদ দ্বারা উক্ত মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। ১৮৫০ সাল থেকে ঐ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম ৭৭ বছর পর্যন্ত ১৭ জন ইংরেজ অফিসার উক্ত পদে বহাল ছিলেন। **বিদেশী শাসনামলে সুকৌশলে বহু জাল হাদীসের সংমিশ্রণে উল্লেখিত পাঠ্যক্রম ও মাসলা মাসায়েলের পুস্তকাদি রচনা করে কোরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে কলুষিত করা হয়। ফলে উপমহাদেশের মুসলিমগণ সুন্নী, শিয়া, শাফেয়ী, কাদিয়ানী, মেমন, আহলে হাদীস ইত্যাদি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অখন্ড ইসলামকে খন্ড খন্ড করে ফেলে।**

বাংলাদেশে মাযহাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ, এখানকার জনগোষ্ঠির প্রায় ৮৬% মুসলমান। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ধর্মভীরু সুন্নী, কিন্তু সঠিক ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তারা প্রায়শঃই বিভিন্ন ধরণের শিরক, বিদ'আতকে ইসলামী শরিয়াহ-র অংশ হিসাবে গণ্য করে আসছে। এরা মাযহাব সম্বন্ধে খুবই সচেতন, এক মাযহাব অনুসারী অন্য মাযহাবীকে তাচ্ছিল্যভাবে দেখে।

এদের বেশীর ভাগের ধারণা চারজন ইমামের অনুসরণীয় মাযহাব স্বীকার করা ফরজ, শরীয়তের উপর আমল করতে চার ইমামের একজনের পয়রবী করা ওয়াজিব, বিপরীত করলে অর্থাৎ যে কোন একটি মাযহাব না মানলে শরীয়ত হতে খারিজ হতে হবে, এক মাযহাব-এ থেকে অন্য মাযহাবের কোন অংশ অনুসরণ করা যাবে না, চারজনের মধ্যে আজীবন শুধু মাত্র একজনের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন অপসংস্কৃতির সংমিশ্রনে এদেশে যে সব আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছে সেগুলির বেশির ভাগই ভ্রান্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত সঠিক আচার আচরণ নয়। এই কারণেই বর্তমানে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের আদায়কৃত সালাত এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদায়কৃত সালাতের তরীকার মধ্যে সচরাচর ভিন্নতা দৃশ্যমান হয়। তাই মাযহাব-এর শাব্দিক অর্থ কি, চার মাযহাব কখন সৃষ্টি হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের মাযহাব কি ছিল, চারজন ইমাম কোন মাযহাব মানতেন, চার মাযহাব মানা কি ফরয, মাযহাব ইসলামের কি ক্ষতি করছে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার মাধ্যমে মাযহাব সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা ও কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত সঠিক দিকনির্দেশনা জেনে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

মাযহাব বলতে কি বুঝায়?

মাযহাবের সঠিক অর্থ চলার পথ, কিন্তু মাযহাব অনুসারীগণ এর অর্থ করেন মত ও পথ। এই অর্থে দুনিয়ার যত মত ও পথ আছে সবই মাযহাব। ইমাম আবু হানিফার মত ও পথ হানাফী মাযহাব। অনুরূপ ইমাম মালেকের মত ও পথ মালেকী মাযহাব, ইমাম শাফেয়ীর মত ও পথ শাফেয়ী মাযহাব ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত ও পথ হাম্বলী মাযহাব। তা হলে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মত ও পথ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদী মাযহাব। আর সকলের মত ও পথের চেয়ে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মত ও পথ যে অতি উত্তম ও উৎকৃষ্ট মত ও পথ এ কথা কোন মুসলমানকে বলে দিতে হবে না। কাজেই অন্যান্য সকলের মত ও পথকে বর্জন করে মহানবীর মহাপবিত্র মত ও পথেই আমাদেরকে চলতে হবে। অন্য কারো মতে ও পথে চলার জন্য নির্দেশ নাই।

যে সকল ইমামদের নামে মাযহাবের নামকরণ হয়েছে তাদের জন্মের আগে মাযহাব ছিল না, তাঁদের যামানায় মাযহাবের উদ্ভব হয় নাই। মাযহাব হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর বহুদিন পরে। ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে; ইমাম মালেকের জন্ম ৯০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে; ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরীতে, মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে; আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম ১৬৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে। যেদিন ইমাম আবু হানিফার মৃত্যু হল সেই দিন ইমাম শাফেয়ীর জন্ম হয়েছে। এই দুই জনের পরস্পরের সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাত হয় নাই। মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে ৪০০ হিজরীতে। ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর ২৫০ বৎসর পরে। এই চার ইমামের জন্মের পূর্বেও ইসলাম ছিল, মুসলিম ছিল। তখন যদি কারোর মত ও পথের প্রয়োজন না হয়ে থাকে তাহলে ৪০০ বৎসর পরে প্রয়োজন হবার বা ফরয হবার কোন যুক্তি থাকে না। তখনও মুসলিমদের কাছে কুরআন ও হাদীস ছিল, এখনও আছে, কাজেই কুরআন ও হাদীসই যথেষ্ট। সুতরাং নির্ভুল কুরআন হাদীসই মুসলিমদের মেনে চলতে হবে। চার মাযহাবের কোন একটিও মেনে চলার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ নাই।

চার মাযহাব ফরয হবার কোন দলীল নেই

আমাদের সমাজে প্রচার রয়েছে চার মাযহাবে চার ফরয। কিছু একটি ফরয হলে তা সমস্ত মুসলিম জাতির জন্যই ফরয হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মাযহাব অনুসরণের কারণে মুসলিম জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ যিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেন, তিনি হাম্বলী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করেন না। এমনিভাবে অন্য মাযহাবীরাও একে অন্যের মাযহাব মানেন না। তাদের কথা হল চার ফরয তথা চার মাযহাবের যে কোন একটি মানলেই হল। তাহলে তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের এক ওয়াক্ত মানলে বা পড়লেই হয়। চার মাযহাব ফরয করতে কোন নবীর আগমন ঘটেনি বরং অজ্ঞ জাহেল ব্যক্তিরাই মাযহাব ফরয দাবী করে মুরতাদ, কাফেরের পরিচয় দিয়েছে। যাদের নামে মাযহাব মানা হচ্ছে তাঁরা কি আদৌ এ মাযহাব তৈরী করেছেন? প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, **ইমামগণ প্রচলিত মাযহাব তৈরী করেন নি বা কাউকে তৈরী করতেও বলেননি এবং তাদের উপর চার মাযহাব ফরযও হয়নি। বরং চারশত হিজরীর পর, অতিভক্তির পরিণতির কারণে এই চার মাযহাবের উদ্ভব হয়।**

যদি ধরেও নেয়া হয় যে ইমামগণ চার মাযহাব তৈরী করেছেন, কিন্তু তা ফরয হল কি ভাবে? তাঁরাতো নবী ছিলেন না। তাদের নিকট ওহীও আসত না। এগুলি তাঁদের নামে মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই না। তাঁদের সময় এবং তাঁদের পূর্বে একটি মাযহাবই ছিল। তাঁরা ঐ একটি মাযহাবকেই মানতেন এবং অন্যকে মানতে বলতেন। ঐ একটি মাযহাবই ফরয যা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

চার ইমামকে (রহঃ) আমাদের তরফ হতে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীস সমূহ পৌঁছেছিল সে অনুযায়ী ইজতেহাদ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে মতানৈক্য হয়েছিল তার বিশেষ কারণ হল এই যে, কারো নিকট কতক হাদীস পৌঁছেছিল যা অন্যের নিকট পৌঁছেনি, কারণ তদানীন্তন যুগে হাদীস সংকলিত হয় নি। আর হাদীসের হাফেযগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, কেউ ছিলেন হিজাযে (মক্কা ও মদীনায়), আর কেউ ছিলেন শ্যামে (সিরিয়ায়), কেউ বা ইরাকে, আবার কেউ মিসরে অথবা অন্যান্য ইসলামী দেশে। সে যুগে এক স্থান হতে অন্য স্থানের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন তিনি ইরাকের পুরাতন মাযহাব ত্যাগ করলেন। কেননা ততক্ষণে তাঁর সামনে বহু নুতন নুতন সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হয়েছিল।

ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্যের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মতে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে ওযু নষ্ট হয় না। দুই ইমামের মতামতের এই বৈষম্যতার কারণে আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল, কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

“ফায়িন তানাযা'তুম ফি শাইয়িন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূলী ইন কুনতুম তু'মিনুনা বিল্লাহী ওয়াল ইয়াওমিল আ'খীরী, যালিকা খাইরুওওয়া। আহসানু তা'বীলান।”

"অতঃপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মিমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা। **{সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৫৯}**

আর আমরাতো কেবল আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত কুরআনের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর রাসূল (সঃ) সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছেঃ

“ইত্তাবিয়ু মা উনযিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম ওয়ালা তাত্তাবিয়ূ মিন দুনুহি আউলিয়াআ কালিলাম্মা তাযাক্কারুন।”

"(হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার (যথাযথ) অনুসরণ করো এবং তা বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কোনো অলি আউলিয়ার পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে চলো।" **{সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৩}**

সত্য কোন সময় একাধিক হতে পারে না। প্রকৃত সত্য হল, ওযু ভঙ্গের কারণগুলির মধ্যে কোন মহিলাকে স্পর্শ করা অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় কোন মহিলার শরীর স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে না।

সুতরাং কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হলে তাকে একথা বলা জায়েয নয় যে, এটা আমাদের মাযহাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমামের ইজমা (ঐকমত্য) হচ্ছে যে সহীহ হাদীস গ্রহণ করবে এবং ঐ সমস্ত মতবাদ পরিহার করবে যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।

হাদীস সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

নীচে ইমাম (রহঃ) গণের কতিপয় উক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। তাদেরকে কেন্দ্র করে যেসব দোষারোপ করা হয় তাঁদের এই উক্তির মাধ্যমেই তা দূরীভূত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট রূপে উদঘাটিত হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই যার ফিকহের নিকট ঋণী সেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ

(১) কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞাত না হবে যে, তা আমরা কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছি।

(২) আমার দলীল না জেনে, শুধু কথার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেয়া হারাম। কারণ আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আগামীকাল আবার ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

(৩) যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূল (সঃ) এর হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে আমার কথাকে পরিহার করবে।

(৪) যদি কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় তাহলে ওটা মাযহাবের প্রতিকূলে হলেও ঐ হাদীসেরই উপর আমল করতে হবে, আর সেটাই হবে আমার মাযহাব। **কোন মুকাল্লিদ (অন্ধানুসারী) সেই হাদীসের উপর আমলের দরুন হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবেনা।**

(৫) যদি হাদীস সহীহ প্রকট হয়, তবে ওটাই আমার মাযহাব।

গ্রন্থসূত্রঃ আল-হাশিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬ / রসমুল মুফতী, পৃ ৪ / শরহে হেদায়া / আল এনতেকা ফী ফাসায়েলিস সালাসাতিল আয়েম্মাতিল ফোকাহা, পৃ ১৪৫ / এলামুল মোআক্কেঈন, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০৯ / আলবাহারোর রায়েক, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৯৩, রসমুল মুফতী, পৃ. ৭৭ / আলঈকায, পৃ. ৫০

ইমাম মালেক (রহঃ) যিনি মদীনাবাসীদের ইমাম বলে সুবিদিত ছিলেন, তিনি বলেনঃ

(১) আমিতো একজন মানুষ মাত্র, ভুলও বলি, সঠিকও বলি। তাই আমার অভিমতকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে যেগুলো কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয় তা গ্রহণ কর, আর যে গুলো কুরআন ও হাদীসের প্রতিকূলে হয়, তাকে পরিহার কর।

(২) রাসূল (সঃ) এর পরে কোন ব্যক্তি নেই যার সব কথা গ্রহণীয়, বর্জনীয় নয় বরং কিছু কথা গ্রহণীয় হতে পারে আবার বর্জনীয় হতে পারে। একমাত্র রাসূলের (সঃ) কথার সবগুলোই গ্রহণীয়, কোন কিছুই অগ্রহণীয় নয়।

গ্রন্থসূত্রঃ আলজামেউ ফী বয়ানিল এলম, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৭, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২ / উসূলুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৪৫-১৭৯ / আলঈকায, পৃ. ৭২ / এরশাদুল সালেক, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৫ / তকীউদ্দীন সুবকী (র.) এর ফতোয়া গ্রন্থের ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৮

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যিনি আহলে-বাইতের (নবীর বংশধরের) একজন, তিনি বলেনঃ

(১) এমন কেউ নেই যার নিকট রাসূলের (সঃ) সমস্ত হাদীস পৌঁছেছে বরং কিছু হাদীস পৌঁছেছে আর কিছু তাঁর অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তাই আমি যত কথাই বলিনা কেন, আর যতই কায়দা প্রণয়ন করিনা কেন, যদি রাসূল (সঃ) হতে তার প্রতিকূলে কোন কথা থাকে তবে রাসূল (সঃ) এর কথাই গ্রহণযোগ্য আর সেটাই আমার উক্তি বা মত।

(২) মুসলমানদের ইজমা (ঐকমত্য) এই যে, যদি কোন ব্যক্তির নিকট রাসূল (সঃ) এর কোন সুন্নাত স্পষ্টভাবে প্রকট হয় তবে তাঁর কথা ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

(৩) যদি আমার কোন কিতাবে রাসূল (সঃ) এর হাদীসের বিপরীত কোন কথা পাও, তবে রাসূল (সঃ) এর কথাকেই গ্রহণ করবে সেটাই আমার মত।

(৪) যদি কোন হাদীস সহীহ হয় তাহলে সেটাই আমার মাযহাব।

(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) কে সম্বোধন করে উক্তিঃ তোমরা আমার অপেক্ষা, হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। অতএব যদি কোন হাদীস সহীহ সূত্রে পাও তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে যেন আমি তা অবলম্বন করতে পারি।

(৬) যে সমস্ত মাসআলা আমি বলেছি তার প্রতিকূলে যদি হাদীস বিশারদদের নিকট সহীহ হাদীস প্রমাণিত হয়, তাহলে আমার বলা মাসআলা থেকে আমি আমার জীবদ্দশাতে ও মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করছি।

গ্রন্থসূত্রঃ তারীখে দেমাশক / আলঈকায, পৃ. ৫৮, ১০০, ১০৪, ১০৭, ১৫২ / এলামুল মোআক্কেঈন, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০২, ৩২৫, ৩৬১, ৩৬৩-৩৬৪, ৩৭০ / যম্মুল কালাম, ৩য় খন্ড, পৃ. ১, ৪৫ / আল এহতেজাজ বিশশাফেয়ী, ৮ম খন্ড, পৃ. ২ / ইবনে আসাকের তারীখ গ্রন্থের ১৫তম খন্ড, পৃ. ৯, ৯২ / আলমাজমূ, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৩ / আলহেলইয়াতুল আওলিয়া, ৯ম খন্ড, পৃ. ১০৫, ১০৭, ৬০৬ / আলমীযান, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭ / ইবনে আবী হাতেম এর আল আদাবুশ শাফেয়ী গ্রন্থের পৃ. ৯৩-৯৫ / আলএনতেকা, পৃ. ৭৫ / মানরাবেকুল ইমাম আহমদ, পৃ. ৪৯৯ / আলহেরাবী, পৃ. ৪৭ / আল আমালী / আলমোন্তাকা, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৪

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) যাঁকে আহলে সুন্নাতদের ইমাম বলা হয়, তিনি বলেনঃ

(১) আমার তকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করো না, আর না মালেকের (রহঃ), বা শাফেয়ী (রহঃ) বা আওযায়ী (রহঃ) অথবা সাওয়ারীর (রহঃ) বরং তাঁরা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন সেখান হতে গ্রহণ কর (কুরআন ও হাদীস হতে)।

(২) যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর কোন হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করবে সে তো ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থসূত্রঃ আলঈকায, পৃ. ১১৩ / এলামুল মোআক্কেঈন, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০২ / আবূ দাঊদ, মাসায়েলে ইমাম আহমদ, পৃ. ২৭৬-২৭৭ / জামে বয়ানিল এলম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯ / মানাকেবে ইমাম আহমদ, পৃ. ১৮২

কুরআন ও হাদীস অনুসারে মুসলিমদের মাযহাব একটাই

মুসলিম জাতির মত বা পথ একটিই। সেটা হল সহজ সরল সোজা পথ। যে পথ সম্পর্কে বলতে যেয়ে একদিন রাসূল (সঃ) একটা সরল রেখা আঁকলেন এবং তার ডান দিকে দুটি এবং বাম দিকে দুটি রেখা আঁকলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাতকে মধ্য রেখায় রেখে বললেনঃ "এটাই আমার পথ। এটাই আমার সোজা পথ, তোমরা এই পথেরই অনুসরণ কর এবং অন্য পথ সমূহের অনুসরণ করো না। যদি কর তবে তা আল্লাহর সোজা পথ হতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিবে।" {ইব্ন মাজাহ/১১}

মুসলিম জাতির মাযহাব একটিই তা হলো ইসলাম / যারা একমাত্র মাযহাব ইসলামকে ভেঙ্গে চৌচির করেছে তারা ধৃষ্টতার পরিচয়ই দিয়েছে। কারণ তাদের আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দায় দায়িত্ব আল্লাহর নিকট। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"ইন্নাল্লাযীনা ফাররাকু দিনাহুম ওয়াকানু শিয়ায়াল্লাসতা মিনহুম ফি শাইয়িন, ইন্নামা আমরুহুম ইলাল্লাহি ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম বিমা কানু ইয়াফআলুন।"

"যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করছিলো।" **{সূরা আল আনয়াম, আয়াত ১৫৯}**

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

"ওয়া মাইয়্যাবতাগি গাইরাল ইসলামি দিনান ফালাইয়্যুকবালা মিনহু ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাছিরিন।"

"যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে।" **{সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ৮৫}**

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) মানুষের কল্যাণে ইসলামের বিধি-বিধান (ইসলামী শরীয়ত) জারি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই শরীয়তের পূর্ণতার ঘোষণা করে বলেনঃ

"আলইয়াওমা আকলামতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদীতু লাকুমুল ইসলামা দীনান।"

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম" **{সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৩}**

ইন্তেকালের পূর্বে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সঃ) তাঁর সাহাবাগণকে তথা সমগ্র জগতকে সম্বোধন করে বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুটি মহান বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা ঐ দুটিকে মজবুত করে ধরে থাকবে ততদিন গুমরাহ হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।"

শরীয়তের বিধি-বিধান অখন্ড। এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন করা নিষেধ। শরীয়তের প্রতিটি হুকুমের উপর ঈমান আনা এবং সামগ্রিকভাবে শরীয়াত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীয়তের কোন বিধানের বিরোধিতা বা লংঘন একই সঙ্গে ইহকালীন এবং পরকালীন দুটি মারাত্মক পরিণতির কারণ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"ইন্নামা জাযাউল্লাযিনা ইউহরিবুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াছআউনা ফিল আরদি ফাসাদান আইয়্যুকাত্তালু আও ইউসাল্লাবু আও তুকাত্তায়া আইদিহিম ওয়া আরযুলুহুম মিন খিলাফিন আউ য়ুনফাউ মিনাল আরদি, যা'লিকা লাহুম খিজয়ুন ফিদ্দুনইয়া ওয়ালাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আজীম।"

"যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, (তাছাড়া) পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।" **{সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৩৩}**

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও উল্লেখ করেছেন,

"কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তবিয়ুনী ইউহবিবকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যুনুবাকুম, ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম।"

"(হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, (আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" **{সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ৩১}**

এই পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তার সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তবে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই, তা অগ্রাহ্য।

আল্লাহর রাসূলের (সঃ) পর চারশত বছর পর্যন্ত রাসূল (সঃ)-এর মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব, তাঁর নির্দেশানুসারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর সুন্নাতকে মজবুত করে ধরে থাকাই গুমরাহী হতে বাঁচার একমাত্র উপায়।

মাযহাবের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

এই একবিংশতিতম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান দুনিয়ার প্রায় ১৪০ কোটি মুসলমানই সর্বত্র কমবেশী নিগৃহীত হচ্ছে এ জন্য যে, মুসলমানরা বিভিন্ন মাযহাব, ফিরকাহ ও ঘরানায় বিভক্ত এবং সাধারণ (Common) শত্রুর বদলে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বেই অধিকতর লিপ্ত। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মাযহাব, ফিরকাহ, ঘরানা নির্বিশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এখনই গড়ে না তুললে সামাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

~~~ সমাপ্ত ~~~

* তথ্য-উপাত্তগুলো সংকলন করেছেন মুহাম্মদ আবু হেনা

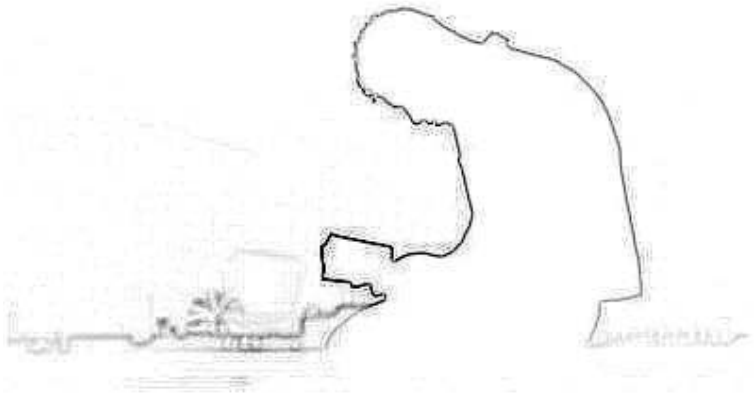

পিডিএফ বিন্যাসঃ ট্রু ক্যাফে সাইবারক্যাফে
~~~